"আমি আমাদের দেশকে শান্তি, আশা, স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সব ধরনের দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে স্বাগত জানাই"

—— রওশন এরশাদ

হে মুমিনগন! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় স্বাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যা কর আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন"

সূরা মায়িদা (৫ ঃ ৮)

আপনি যখন খুশি হন তখন জীবন আরও ভাল হয়, কিন্তু জীবন তখন সেরা হয় যখন আপনার কারণে অন্যরা খুশি হয়; অন্যের হৃদয় স্পর্শ করার জন্য বিশ্বস্ত হন। একটি অনুপ্রেরণা হন। প্রকৃতির কোন কিছুই নিজের জন্য বাঁচে না; নদীগুলো নিজেদের পানি পান করে না। গাছ নিজের ফল খায় না। সূর্য নিজের জন্য জ্বলে না এবং ফুল নিজের জন্য তাদের সুবাস ছড়ায় না। অন্যের জন্য বেঁচে থাকা প্রকৃতির নিয়ম। আমরা সবাই একে অপরকে সাহায্য করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি। আপনি নিজেকে যতই কঠিন পরিস্থিতিতে খুঁজে পান না কেন, তবুও অন্যের উপকার করুন। সৎ, নম্র, যত্নশীল, মানবিক মূল্যবোধ বজায় রাখুন; বড়দের সম্মান করুন এবং ছোটদের ভালোবাসুন। ভালোবাসুন আপনার মা ও মাতৃভূমিকে।

৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে

অন্য সব রাজনৈতিক দল ও সরকার প্রধানদের মত কেবল কথামালা, বক্তৃতার ফুলঝুরি দিয়ে, পরিকল্পনায় স্বর্গ রচনা করে, উন্নয়নের মরিচিকা দেখিয়ে, কল্পনার ফানুষ উড়িয়ে, মিথ্যা প্রচারের ঘোড়া দাবড়িয়ে ব্যক্তিগত, দলগত, গোষ্ঠিগত স্বার্থ উদ্ধারে অহর্নিশ নিয়োজিত না থেকে এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধকে জাতীয় ঐক্যে ফাটল, বিভেদ, বৈষম্য সৃষ্টি আর ব্যক্তি ও মহল বিশেষের স্বার্থ উদ্ধারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না করে পল্লীবন্ধু ক্ষমতাশীন হয়ে দেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষি ও ৬৮ হাজার গ্রামে বসবাসকারী দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠি কৃষকের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে নীতি হিসাবে ঘোষণা করেছেনঃ "৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে"। পল্লীবন্ধু'র এ ঐতিহাসিক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা যে কেবলমাত্র মৌখিক নয়, মরিচিকা নয়, কল্পনাবিলাসী, কাগুঁজে নয়, একান্তই আন্তরিক এবং বাস্তব তা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, প্রকল্পসমূহ সামগ্রিকভাবে বিচার বিবেচনা, বিশ্লেষণ করলে জাতীয় জীবনে বিশেষ করে পল্লীবাসী কৃষক জনগণের জীবনে কত গভীর প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল, দৃষ্টিজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ মাত্রই তা উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

গোলামী যুগের ঔপনিবেশিক শোষণ, বিভেদ বৈষম্যমূলক ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা, ভূমি সংস্কারের কথা বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে এ দেশের বহু রাজনৈতিক মঞ্চে দল নেতা ও রাষ্ট্র প্রধান মুখে বড় বড় গলায় বলেছিলেন কিন্তু সামন্তবাদী স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে ঐ দুরূহ কাজটি বাস্তবায়িত করার জন্য কোন সরকার ও সরকার প্রধানকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এ দেশে পল্লীবন্ধু এরশাদই প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি শত শত বছরের শোষণের এই জগদ্দল পাথরের উপরে সরাসরি সংস্কারের হাতুড়ি চালিয়েছেন ভূমি সংস্কারের নীতি গ্রহণের মাধ্যমে। পল্লীবন্ধু এরশাদ এ দেশের 'মাটি, মানুষ ও পানির' সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে "উৎপাদন ও উন্নয়নের' রাজনীতিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ক্ষেত্রে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষক জনগণের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে যে সকল বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যকর করার মাধ্যমে লাখো লাখো কৃষক জনতার হৃদয়-নিংড়ানো অর্ঘ তাঁকে দেয়া "পল্লীবন্ধু" পদবীকে স্বার্থক করে তুলেছেন তারই একটি সার সংক্ষেপ ধারা বিবরণী এই নিবন্ধর সাথে জুড়ে দেয়া হলো ঃ

পল্লীবন্ধু এরশাদের ঘোষণা ও কাজ

১। মান্ধাতার আমলের ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে ভূমি সম্পদকে মানুষ শোষণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না করে জাতীয় স্বার্থ, মানুষের কল্যাণে, উন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য ১৯৮২ সালে একটি বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কারের নীতি গ্রহণ করেছেন। ঐ নীতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

২। জমিতে চাষীর আবাদী স্বত্ব অন্যূন ৫ বছরের জন্য উৎখাতের অযোগ্য করে আইন পাস করেছেন।

৩। ঐতিহাসিক তে-ভাগা আন্দোলনের মূলনীতির আলোকে বর্গা চাষীর ফসলের হিস্যাঃ বর্গা চাষীর শ্রমের জন্য একভাগ, কৃষি উপকরণের জন্য এক ভাগ এবং জমির জন্য এক ভাগ নির্ধারণ করে আইন করেছেন।

৪। কৃষি জমির সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা নির্ধারণ করেছেন এবং সিলিং বহিঃর্ভূত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন, বেনামী জমি হস্তান্তর রোধ করার আইন করেছেন।

৫। দেশের ৬০% ভাগ কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেত মজুরদের ন্যূনপক্ষে সাড়ে তিন কেজি চাল অথবা সম মূল্যের অর্থ মজুরী হিসাবে প্রদান করার আইন করেছেন।

৬। সিলিং উদ্ধৃত জমি ভূমিহীন অথবা ১০ বিঘার কম জমির মালিক এমন কৃষক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করার আইন করেছেন।

৭। সরকারী, বে-সরকারী কোন সংস্থা বা মহল ঋণের দায়ে বা অন্য কোনভাবে কৃষকদের বাস্তু ভিটা থেকে উৎখাত করতে না পারে এজন্য আইন করেছেন এবং কোন ব্যক্তি তাঁর নিজের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

৮। কৃষক সমাজের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার জন্য ঋণ ও সুদের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য সরাসরি কৃষি ঋণের সুদ মওকুফের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৯। কৃষি ঋণ সহ বিভিন্ন প্রকারের ঋণ গৃহীতাদেরকে ঋণের সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য 'ঋণসালিসী বোর্ড' গঠন করেছেন।

১০। উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর জমির সত্বর জরিপ করে নদী সিকস্তি ও পায়স্তি হলে সাবেক প্রজা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমিহীন, স্বল্প ভূমিচাষীদের মধ্যে আবাদের শর্তে বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

১১। কৃষকের কৃষিঋণ সহজলভ্য করার জন্য এবং কৃষকরা যাতে টাউট-বাটপারদের খপ্পরে না পড়ে সেজন্য বার্ষিক ভিত্তিতে কৃষিঋণ মঞ্জুরীর 'প্যাকেজ ডিলের' ব্যবস্থা করেছেন। উল্লেখ্য, এই কৃষিঋণের পরিমাণ ১৯৮১-৮২ সালের ৪২৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৪-৮৫ সালে ১১৫০ কোটি টাকা এবং ৮৫-৮৬ সালে ১২৭৫ কোটি টাকা, এভাবে ক্রমবর্ধিত হারে কৃষিঋণ দানের ব্যবস্থা করেন।

১২। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের আমলে ৮ লাখ একর জমি খাসে এনে ভূমিহীন, বিত্তহীনদের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩। শিল্পখাতে যেখানে ৯ ভাগ সুদে ঋণ দেয়া হয়, সেখানে কৃষি নির্ভর এ দেশে কৃষি ঋণের সুদের হার ২২ ভাগ। অথচ জাতীয় আয়ের ৫০% ভাগই আসে কৃষিখাত থেকে। সুদের এই তারতম্য-বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

১৪। পল্লীবন্ধু সরকারের আমলে কৃষক ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিকট কৃষি ঋণের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পল্লী এলাকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৪৮ টি শাখাকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৫। এরশাদ সরকার আমলে কেবলমাত্র খাস জমি নয়, গরু কেনার জন্য, হাল দেয়ার জন্য, সার-বীজ, কিটনাশকসহ কৃষি উপকরণ সংগ্রহের জন্য ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৬। দেশের সকল জমির পুনরায় জরিপ করে রেকর্ড খতিয়ানে কারচুপির সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৭। এরশাদ সরকার আমলেই শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করা হয়েছে এবং অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবমুখী ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৮। আয় অনুপাতে খাজনা কর প্রথার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং ভূমিকর, উন্নয়ন করের উপর সুদ আরোপের প্রথা রহিত করা হয়।

১৯। এজমালী সম্পত্তির খাজনা অংশীদারের অংশ হিসাবে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকার আমলে ঠিকানাহীন, ভাসমান, বিত্তহীন, ভূমিহীন, ছিন্নমূল কৃষকদের মাথা গোজার ঠাঁই করে দেয়ার জন্য পল্লীগ্রামে 'অপারেশন ঠিকানার' মাধ্যমে 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্প এবং শহরাঞ্চলে 'সিটিপল্লী' প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৬০টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি করে গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং প্রায় ১২ হাজার পরিবারকে জমি ও বাড়ী দেয়া হয়েছে।

২১। পল্লীগ্রামে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে পল্লী বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেচ ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছেন।

২২। পল্লী এলাকায় জনগণের মধ্যে খাদ্যের সুষম বণ্টন, খাদ্য নিরাপত্তা ও মৌজুদ বৃদ্ধির জন্য ৪৬০টি উপজেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্য গুদাম, বীজাগার নির্মাণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব গুদামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাজার হাজার বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৩। পল্লীবন্ধু এরশাদের নির্দেশক্রমে পল্লীগ্রামের জনগণের মধ্যে সরকারী মূল্যে চাল, গম সহজলভ্য করার লক্ষ্যে পল্লীরেশনিং এর ব্যবস্থা হয়েছিল। যার ফলে অসাধু ব্যবসায়ীদের মূল্য বৃদ্ধির কবল থেকে পল্লীগ্রামের মানুষ রক্ষা পেয়েছে। পল্লীরেশনিং এর আওতায় দেশের ৪৪৪৭টি ইউনিয়নে ভূমিহীন, নিম্নবিত্তদের মধ্যে গড়ে এক হাজার প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে রেশন দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে সারা দেশের ১৪৮১ লক্ষ্য পরিবার রেশন পাবার ও খাদ্যের অভাবে যাতে কেউ অভূক্ত না থাকে, মারা না যায় তার নিশ্চয়তা বিধান হয়েছে।

২৪। কৃষক সমাজের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য কৃষকদেরকে ঋণের সুদের বোঝা থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের ৭ই অক্টোবর শেরে বাংলা নগরে জাতীয় স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃষক পার্টির সম্মেলনে ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করেছেন। যার পরিমাণ ৬০০ শত কোটি টাকা।

২৫। কৃষিঋণ বিতরণে মধ্যবিত্ত টাউটদের খপ্পর থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য পাশ বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৬। প্রকৃত কৃষক ও গ্রামীণ পেশাজীবীদের জন্য ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করেছেন।

২৭। কৃষক যাতে তার প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের সরাসরি ন্যায় সংগত মূল্য পায় এবং ফরিয়াদের খপ্পরে পড়ে পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হতে না হয় এজন্য পল্লীবন্ধু এরশাদ ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে সমুদয় পাট সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে খরিদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৮। পল্লীবন্ধু এরশাদ দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারীদের কবল থেকে পাট ও পাট শিল্পকে রক্ষার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক পাটের গুদামে সুপরিকল্পিত অগ্নিকান্ডের ঘটনা বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

২৯। পাটচাষী কৃষকদের স্বার্থে লোকসানে জর্জরিত পাট শিল্প, কল-কারখানাগুলোকে ব্যক্তিগত খাতে হস্তান্তর করে চালু করার ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন। এর ফলে এরশাদ সরকার আমলে শিল্প কারখানাগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

৩০। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে দেশে নতুন নতুন সার কারখানা নির্মাণ করে সার উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে এবং পল্লীবন্ধু সরকার আমলে সারের ঘাটতি অবস্থা পুরণ করে বিদেশে সার রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩১। পল্লীবন্ধু এরশাদ "জাল যার জলা তার" এই নীতি অনুমোদন ও প্রবর্তন করে প্রকৃত মৎসজীবী জেলেদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ-দানের ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীদের ব্যবস্থাপনায় নদী, জলা, দীঘি, নালা, হাওর-বাওর তথা জলমহাল হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেছেন। ইজারা দানের প্রথা স্থগিত করেছেন, মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিবর্তে সমবায় ভিত্তিতে প্রকৃত জেলেদের মধ্যে জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার বিধান চালু করেছেন।

৩২। প্রকৃত জেলেদের জাল, নৌকা ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

৩৩। মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও মৎস্য প্রজননে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য দেশের প্রধান প্রধান মৎস্য এলাকায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩৪। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় রপ্তানীমুখী চিংড়ি চাষকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং চিংড়ি প্রজনন, চিংড়ি খামার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হয়।

৩৫। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকার পল্লী গ্রামে তাঁতীদের নেয়া ঋণের সুদ মওকুফ করেছেন এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায় বন্ধ করেছেন।

৩৬। দেশে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পল্লীবন্ধু এরশাদ দেশের তাঁতী সম্প্রদায়কে সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করে তাঁত শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়েছেন এবং তাঁত শিল্প ও তাঁতী সমাজকে ভারতীয় বস্ত্র আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এর ফলে পাবনা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, ঝালকাঠি, কুষ্টিয়া, নরসিংদীসহ দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার তাঁতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, দেশীয় বস্ত্রের মান উন্নয়নের ফলে দেশী কাপড়ের কদর বেড়ে যায়, ভারতীয় 'উলঙ্গবাহার' শাড়ী আমদানী ও চোরাচালানী কমে যায়, জাতীয় বস্ত্র খাত স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে যায় ।

৩৭। রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্প তথা গার্মেন্টস শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে দেশের প্রায় ২ লক্ষ নারী শ্রমিক, ১ লক্ষ পুরুষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এরশাদ সরকারের আমলেই পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৫ম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

৩৮। চোরাচালানের মাধ্যমে আমদানীকৃত বিদেশী শাড়ি ও কাপড়-চোপড় আটক করে দুঃস্থদের মধ্যে দান করা হয়েছে এবং দেশীয় তাঁত শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ সাধন করা হয়েছে এবং শক্তিশালী তাঁত বোর্ড গঠন করা হয়।

৩৯। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের আমলে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের, দুমুঠো ভাতের নিশ্চয়তা বিধানে, দেশকে দুর্ভিক্ষমুক্ত, খাদ্যাভাবমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত এক নতুন বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। যার ফলে বার্ষিক খাদ্য উৎপাদন ১৯৭১ সালের ৯৭ লক্ষ টন থেকে ১ কোটি ৮৫ লাখ টনে উন্নিত হয়।

৪০। এরশাদ সরকারের আমলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে চালের দাম ৮ টাকার উপরে কখনই উঠেনি। দীর্ঘ ৯ বৎসরের মধ্যে দেশের কোথাও দুর্ভিক্ষ হয়নি, খাদ্যাভাবে, দুর্ভিক্ষের কারণে দেশের কোথাও একটি মানুষকেও মরতে হয়নি, দুর্ভিক্ষের কারণে দেশের কোথায়ও লঙ্গরখানা খুলতে হয়নি। এরশাদ আমলে কাউকে ৪০/৪৫ টাকা দরে চাল, ২০ টাকা দরে লবন, ১০০ টাকা দরে ডাল খেতে হয়নি। চাল, ডাল, তেল, লবন, হলুদ, মরিচ, পিয়াজ-রসুন, কাগজ, দুধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এমন লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি পায়নি, জনজীবনে এমন নাভিঃশ্বাস কখনই দেখা দেয়নি।

৪১। পল্লীবন্ধু এরশাদ-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও তদারকিতে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ ফলনশীল ধানবীজের উদ্ভাবন করেছে, ইরিসহ বিভিন্ন জাতের প্রচুর পরিমাণ চাল উৎপাদন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

৪২। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের আমলেই বন্যার পরে রোপন করা যায় এমন জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং বন্যার মধ্যেও টিকে থাকতে পারে এমন জাতের ধান উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪৩। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের আমলে দুটি ভয়াবহ বন্যা (১৯৮৭-১৯৮৮) এবং দুটি ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস (১৯৮৫, ১৯৮৮) হয়েছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু এরশাদ আপ্রাণ ও নিরলস সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ফলে অতি অল্প সময়ে এসব অকল্পনীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় সফল ও সক্ষম হন। এজন্য তিনি দেশে-বিদেশে সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। এসব দুর্যোগকালে প্রতিবারই দেশে-বিদেশে মহা দুর্ভিক্ষের আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিবারই এরশাদ সরকার সে আশংকাকে অমূলক প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪৪। ১৯৮৭ সালের নজীরবিহীন ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে কৃষিঋণ গৃহীতাদের উপর থেকে সরকার সকল প্রকার সার্টিফিকেট, মালক্রোক প্রভৃতি স্থগিত রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪৫। ১৯৮৮ সালে প্রলয়ংকারী বন্যায় ধবংসলীলার চরম বিপর্যয় থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার জন্য বন্যা-উত্তর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দসহ বীজ ধান, গমের বীজ, রবি শষ্যের বীজ ও পশু খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪৬। ১৯৮৮ সালের নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থ, ধবংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ী নির্মাণ, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য কৃষকদের সর্বপ্রকার ঋণ সহজলভ্য করার জন্য ঋণদান সংস্থা, ব্যাংকসমূহকে জরুরী নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪৭। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত উরিরচরের প্রতিটি পরিবারকে রেজিষ্ট্রি দলিল করে খাস জমির বন্দোবস্ত এবং বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্যে এক কক্ষবিশিষ্ট পাকা বাড়ী দান করা হয়েছে।

৪৮। দুর্যোগ মোকাবিলায় মহা ব্যবস্থাপক সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির এবং বাংলাদেশের মানুষের দুর্জয় সাহসী ভূমিকা ও প্রতিরোধের কথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সমর্থ হন।

৪৯। সর্বোপরি বন্যার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা জাতীয় ঐক্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে "জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ পরিষদ" গঠন করেন। যাতে রাজনৈতিক দল, সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবি ও বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্ব রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

৫০। দুর্যোগ প্রতিরোধ পরিষদের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে সাব কমিটি গঠন করে বন্যা প্রতিরোধ প্রশ্নে তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছেন।

৫১। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীকে কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ।

৫২। বন্যা সমস্যার স্থায়ী ও কার্যকর সমাধানের জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক সহযোগিতা। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ সেই বঞ্চিত আঞ্চলিক সহযোগিতার সন্ধানে সংশ্লিষ্ট সবকটি দেশ ভারত, নেপাল, গণচীন ও ভুটান সফর করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে মত বিনিময় করেছেন।

৫৩। আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়া বন্যা সমস্যা সমাধানের প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে বিগত ৫০ বছর ধরে শুধু বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রস্তাব আর দাবীই করা হয়েছে। দাবী তোলা হয়েছে বন্যা সমস্যা জাতিসংঘে তোলার জন্য। কিন্তু কোন সরকারই তা করেনি। এরশাদ সরকার বন্যা সমস্যা জাতিসংঘে তুলেছে। জাতিসংঘ পল্লীবন্ধু এরশাদ-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ বৈঠক হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব নিজেও ঐ সময় বাংলাদেশ সফর করেছেন।

৫৪। কেবল জাতিসংঘ নয়, বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা কমনওয়েলথ, ইসলামী ঐক্য সংস্থা, ৭৭ জাতি গ্রুপ, সার্ক, কলম্বো প্লান, ইসি, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ সমস্ত ফোরামে তোলা হয়েছে এবং সমস্ত সংস্থা এক বাক্যে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বন্যা ও দুর্যোগ বাংলাদেশে অতীতেও হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্ব ছিল একেবারে নির্লিপ্ত। এরশাদ তার ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতির বদৌলতে সেই নির্লিপ্ত বিশ্বকে বাংলাদেশের স্বপক্ষে টানতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার ফলে বাংলাদেশের বন্যা এখন বিশ্ববাসীর কাছে একটি গুরুতর মানবিক সমস্যা রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

৫৫। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রচেষ্টার স্বীকৃতির প্রমাণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দুর্যোগ সাহায্য আইন ৮৮ পাশ করেছে।

৫৬। একই অনুভূতি নিয়ে ফরাসী সরকারও এগিয়ে এসেছে। বন্যার সময় ফরাসী ফাস্টলেডী বাংলাদেশ সফর করেছেন। পরবর্তীকালে ফরাসী প্রেসিডেন্ট মিতেরার উদ্যোগে একটি ইউরোপীয় পানি বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশ সফর করেন এবং তারা বন্যা নিরোধে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৫৭। প্রতিবেশী গণচীন সরকারও তাদের একটি শক্তিশালী বন্যা বিশেষজ্ঞ দলকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে এবং তারা বন্যা নিরোধে চীনের অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলাদেশকে সব রকমের সাহায্য দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে।

৫৮। জাপান, বৃটেন, ইতালী প্রভৃতি উন্নত দেশসহ পৃথিবীর সব মহাদেশের সাথে বন্যা প্রশ্নে একটি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতামূলক যোগাযোগ এরশাদ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

৫৯। এরশাদ সরকার ফারাক্কাসহ ভারতের সাথে পানি সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধে জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক সম্মানজনক সমাধানের প্রচেষ্টা জোরদার করেছেন। পানি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, চীনসহ আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬০। খরাজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় বর্ষা মওসুমে অতিরিক্ত পানি ধরে রাখার জন্য দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

৬১। অধিকতর বন্যা প্রবল নদীগুলোর দুই তীরে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ ও নদী ভাঙ্গন নিরোধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৬২। উপকূলীয় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ ও উপকুলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা নতুন চরসমূহে বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা প্রতিরোধের দেয়াল সৃষ্টি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

৬৩। ভরাট নদ-নদী, খাল, পুকুর, ডোবা খনন করে পানির সুচারু সরবরাহ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

৬৪। ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাবনা সেচ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

৬৫। এরশাদ সরকার আমলে ত্রিশটি নদীর খনন কাজ ও প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য দেশের প্রথম সাকশান্স ড্রেজার ফরাসী থেকে ক্রয় করা হয়।

৬৬। ৪,৫০০টি ইউনিয়নে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন।

৬৭। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় জনিত দুর্যোগের দ্রুত মোকাবিলা ও ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য ৩২৫টি উপজেলায় হেলিপ্যাড নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে অনেকগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

৬৮। জরুরী ভিত্তিতে বৃহত্তর ঢাকা বন্যা নিরোধ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং বিশ্ববাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

৬৯। এরশাদ সরকারের আমলে বন্যায় ক্ষতি করতে পারবে না, এমন সব সহজে নির্মাণযোগ্য ও সহজে (৯০ মিনিটে) অপসারণ ও বহনযোগ্য কারখানায় নির্মিত স্বল্প ব্যয়ের হাল্কা বাড়ী উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং কারখানায় বাড়ী নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়।

৭০। ঝড় বাদলের দেশ বাংলাদেশে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুর্যোগে জান-মালের ক্ষতি যাতে কম হয়, মানুষকে যাতে কম কষ্ট ভোগ করতে হয়, সে লক্ষ্যে এরশাদ সরকার স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাৎক্ষনিকভাবে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেছেন।

৭১। এরশাদ সরকার আমলে দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্যমত গড়ে তোলার জন্য শুধুমাত্র বন্যা ও বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য জাতীয় সংসদের ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৭২। নির্মাণ নীতিতে, সমস্ত নির্মাণ কাজে বন্যা সমস্যাকে বিবেচনায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

৭৩। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের আমলে পল্লীর জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিটি উপজেলায় হেলথ কমপ্লেক্স তথা হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৭৪। পল্লীর প্রসূতিগণ যাতে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে এজন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন।

৭৫। উপজেলার বাইরে হেলথ সেন্টার ও সাব-সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তারদের বাধ্যতামূলকভাবে সেখানে কাজ করার বিধান করা হয়েছে। ফলে অবহেলিত পল্লীর জনগণের উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে।

৭৬। ডাক্তারদের লাগামহীন ভিজিটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভিজিটের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ফিস ৪০/- টাকা ধার্য্য করে দিয়েছেন।

৭৭। ডায়রিয়া, আমাশয় প্রভৃতি পানিবাহিত রোগে যাতে মানুষের বিশেষ করে পল্লীগ্রামের মানুষের অকাল মৃত্যু না হয় সেজন্য খাওয়ার স্যালাইন উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো হয়েছে। এবং স্যালাইন সরবত তৈরীর ব্যাপারে ব্যাপক জনসাধারণকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

৭৮। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকার দেশী-বিদেশী ঔষধ সাম্রাজ্যের বল্গাহীন শোষণ থেকে পল্লীগ্রামে বসবাসকারী বৃহত্তর জনগোষ্ঠি তথা জাতিকে রক্ষার জন্য বিশ্বনন্দিত জাতীয় ঔষধ নীতি গ্রহণ করে ৪০০০ হাজার রকম ঔষধের মধ্যে লেবেল সর্বস্ত ১৭০০ রকমের অপ্রয়োজনীয় ঔষধ নিষিদ্ধ করেছে। এরশাদ সরকারের এ উদ্যোগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বহু দেশ এই নীতিকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছে। বর্তমান ঔষধ শিল্পের ভাল অবস্থার জন্য এরশাদ সরকারের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

৭৯। দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিদানের সুবিধার্থে দেশে চক্ষুব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে এবং এ আমলে অনেকের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। বিদেশী চক্ষু চিকিৎসকদের সময় সময় বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাবার রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৮০। এরশাদ সরকার আমলে সর্বপ্রথম শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য ঢাকায় একটি শ্রমিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৮১। এতিমখানা গুলোকে শিশু পরিবারে রূপান্তরিত করা হয়েছে ।

৮২। ভাসমান মহিলাদের জন্য ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও আশ্রিতাদের বিভিন্ন উৎপাদনশীল, ক্ষুদ্রশিল্প, হস্তশিল্পের কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮৩। টঙ্গীর এরশাদ নগরে পাকা বাড়ী নির্মাণ করে বাস্তুহারা পরিবারগুলোকে তা দান করা হয়েছে।

৮৪। রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলেই সর্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ণের সর্বময় কর্তৃত্ব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

৮৫। পল্লীগ্রামে বসবাসকারী চির অবহেলিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠি কৃষক সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধর ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার জন্য সার্বজনীন বাধ্যতামূলক গণমুখী শিক্ষানীতি গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে ৬৮ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কর্মসূচী গ্রহণ করে কৃষক সমাজের ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ লাভের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

৮৬। বে-সরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের খাতে সরকারী অনুদান পূর্ববর্তী শতকরা ৩০ ভাগের পরিবর্তে ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮৭। পল্লীবন্ধু সরকারের আমলে সকল শিক্ষকের জন্য ১০০ টাকা বাড়ী ভাড়া ভাতা ও ১০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা সরকারী খাজাঞ্চী থেকে প্রদান করা হয়েছে।

৮৮। গুরুতর জাতীয় সমস্যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণে অতীত সরকারগুলোর তুলনায় অধিকরত বাস্তব ও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে পল্লীবন্ধু এরশাদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের জমির পরিমাণ ও জাতীয় আয়ের সাথে জনসংখ্যার সামঞ্জস্যতা বা সমতা বজায় রাখতে না পারলে দেশের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদকে চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যাবে না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্ণ সুফল ভোগ করতে হলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। জন্মহার বৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে প্রতিটি সংসারের দারিদ্র বৃদ্ধি ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এক বিরাট বাধা। গভীর উপলব্ধিতেই পল্লীবন্ধু এরশাদ জাতিধর্ম দলমত শ্রেণী নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণ বিশেষ করে পল্লীবাসী জনগণের কাছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সচেতন ও আন্তরিক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি গ্রামে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তার এ প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসা ও গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

৮৯। জন্মহার বৃদ্ধি ৩.৮ থেকে কমিয়ে ২.৩ এ নামাতে সক্ষম হয়েছেন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রপতি এরশাদকে জাতিসংঘ কর্তৃক জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

৯০। দারিদ্রের অবসান তথা বেকারত্ব দূরীকরণের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে জাতীয় শিল্পের বিকাশ। শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য এরশাদ সরকার আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিপূরক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন।

৯১। শিল্পের অনুমোদন, ব্যাংক ঋণ, জায়গা-জমি, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি প্রাপ্তিতে যাতে অনাবশ্যক সময় ক্ষেপণ না হয়, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা একই দপ্তরে সম্পন্ন করা যায় সে উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়।

৯২। স্বাধীনতার পর ভর্তুকী সর্বস্ব রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে বাংলাদেশী মালিকদের কলকারখানা সাবেক মালিকদের কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে।

৯৩। ভর্তুকী, ভগ্নদশা আর লোকসানের হাত থেকে জনগণের তথা রাষ্ট্রীয় শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ মুক্ত করার জন্য "হোল্ডিং কোম্পানী" গঠন করা হয়।

৯৪। দেশে একটি শিল্প বিপ্লব ঘটানোর জন্য, ব্যাপক কুটিরশিল্প গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ, ব্যাংক ঋণদান প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

৯৫। ১৯৮২-৮৬ সালের মধ্যে দেশে ৯০০০ নতুন শিল্প ইউনিট গঠনের অনুমতি প্রদান করা হয়। এ সময়ে বে-সরকারী শিল্প খাতে ৬০৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

৯৬। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় বে-সরকারী শিল্প খাতকে উৎসাহ দানের জন্য অসংখ্য ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

৯৭। বিদেশী মূলধন আকৃষ্ট করার জন্য দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২টি শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৯৮। এরশাদ সরকার আমলে দেশে ১৮০টি শিল্প প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য ১৮৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

৯৯। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশ ৬৯ বাতিল করে শ্রমিক কল্যাণধর্মী শ্রমনীতি ও শ্রম আইন প্রবর্তন করেন।

১০০। এরশাদ সরকার সরকারী কর্মচারী ও শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করেছেন। এমনকি সর্বনিম্ন বেতন দ্বিগুণ ঃ ২৭০ টাকা থেকে ৪৬০ টাকায় উন্নিত করেছেন।

১০১। শ্রমিকদের জন্য প্রতি বছর দুই মাসের বেতন অবসর গ্রহণের সময় গ্রাচ্যুইটি হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীত সরকারগুলোর আমলে তা ছিল প্রতি বছরে মাত্র ১৫ দিনের বেতন।

১০২। এরশাদ সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য টাইম স্কেল প্রদান করেছেন।

১০৩। শ্রমিকদের বেতনের শতকরা ৮০% ভাগ পেনশন নির্ধারণ করেছেন। যার সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে ৫০০০ টাকা।

১০৪। দুই ঈদে দুই মাসের বেতনের সমান করে উৎসব বোনাস হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন।

১০৫। এরশাদ সরকার আমলে শ্রমিকদের বেতন ভাতা আরো বৃদ্ধি করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মজুরী কমিশন এবং কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন নামে দুটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

১০৬। এরশাদ সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের যখন তখন চাকরিচ্যুত করার ধারা বন্ধ করেছে।

১০৭। তৎকালীন বিএনপি সরকার প্রধান বিচারপতি সাত্তার কর্তৃক কর্মচ্যুত লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও ব্যাংক কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি এরশাদ চাকরীতে পুনর্বহাল করেছেন।

১০৮। কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু হলে মৃত্যু ভাতা ১৮ মাসের স্থলে ৩৬ মাস হিসাবে বৃদ্ধি করেছেন।

১০৯। "বিশ্বের যা কিছু কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর" জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ দিক নির্দেশনার আলোকে পল্লীবন্ধু কবি এরশাদ নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক কল্যাণে বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছেন।

১১০। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত পল্লীবাসী কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতী, কামার কুমার প্রভৃতি শ্রেণীর নারীদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। এজন্য নারী জাতির সার্বিক কল্যাণে নারী-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন জারী করেন।

১১১। প্রতিটি উপজেলায় পল্লীবন্ধু এরশাদ পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারিবারিক বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা করেছেন। নারী জাগরণে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মেয়েরা নির্যাতিত হয়েও তা হজম করতে কিংবা স্বামী পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশুদের নিয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হত। সামাজিক লজ্জার কারণে দূরবর্তী কোর্ট-কাচারী বা আদালত পর্যন্ত পৌঁছার অসুবিধার কারণে কিংবা অর্থাভাবের কারণে প্রতিকার প্রার্থনার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। পারিবারিক আদালত সে সুযোগ সৃষ্টি করেছে। রুদ্ধদ্বারে বিচারের ব্যবস্থা থাকায় সামাজিক লজ্জার হাত থেকেও মেয়েরা রেহাই পেয়েছে।

১১২। রাষ্ট্রপ্রধান এরশাদ ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ জারী করেন।

১১৩। এরশাদ সরকারের আমলেই সর্ব প্রথম বিবাহে যৌতুক প্রথা বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন জারী করা হয়েছে। যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে কয়েক শতাব্দি ধরে বিরাজ করছে এক ভয়াবহ সামাজিক ক্যান্সারের মত। কথায় সকলেই যৌতুক বিরোধী তবে যৌতুক ভাল যদি অন্যের কাছ থেকে আদায় করা যায়। এই যৌতুকের বিরুদ্ধে টনে টনে বক্তৃতা বিবৃতি হয়েছে কিন্তু প্রতিকার হয়নি। যৌতুক বিরোধী আইন সেই বাঞ্ছিত প্রতিকারের পথ উন্মুক্ত করেছে।

১১৪। মহিলাদের উপর এসিড মারার জন্য মৃত্যুদন্ডের মত কঠিন সাজা দেয়ার আইন করেছেন। ফলে সমাজে কারণে অকারণে মেয়েদের উপর এসিড নিক্ষেপের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

১১৫। মহিলাদের জন্য একটি আলাদা মহিলা পরিদপ্তর স্থাপন করেছেন এবং মহিলা মন্ত্রী নিয়োগের রীতি চালু করেছেন।

১১৬। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের আমলে সরকারী চাকুরীতে ১৫% মহিলাদের জন্য রিজার্ভ করে দেয়া হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১১৭। পেশাজীবি মহিলাদের জন্য কর্মজীবি মহিলা নিবাস স্থাপন করা হয়েছে।

১১৮। অফিস-আদালতে বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

১১৯। মেয়েদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম করার জন্য পল্লীগ্রামের মেয়েদের ৮ম শ্রেণী থেকে বিনা বেতনে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছেন। বালিকা বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

১২০। পরিবারের একমাত্র কন্যা সন্তানকে ডিগ্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

১২১। নারী সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক মুক্তির ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনা এবং প্রতিবন্ধকতার পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে নারী জাতিকে আত্মনির্ভরশীল, আত্মসম্মানজনক, চেতনাবোধ সম্পন্ন, গণতান্ত্রিক অধিকার সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মহা পরিকল্পনা নিয়েই সাবেক রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু এরশাদ গার্মেন্টস শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ করে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ মহিলাদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করেছেন।

১২২। এরশাদ সরকারের আমলে সমাজ জীবনে নৈতিক অবক্ষয়, অধঃপতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গাজা, হিরোইন, মদ, আফিম ধুমপান প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার এবং পতিতাবৃত্তি, চোরাচালানী, চুরি, ডাকাতি, গুম-খুন, ছিনতাই, রাহাজানী, সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। মাদকাশক্তি বিরোধী আইন করে চরম শাস্তির বিধান করেছেন। চোরাচালান রোধে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

১২৩। এরশাদ সরকারের আমলে যোগাযোগ, পরিবহন, যাতায়াত ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জনগণের দেড়শ বছরের স্বপ্নসাধ বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু' নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে, ঢাকার সাথে বৃহত্তর খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর সড়ক পথে দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল হ্রাস পেয়েছে।

১২৪। এ আমলে মেঘনা সেতু, কর্ণফুলী সেতু, টেকেরহাট সেতু, ঢাকার রামপুরা সেতু, টঙ্গী সেতু, সিলেটের শেরপুর সেতু, কালিজিরা সেতুসহ ছোট বড় ৫০৮টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

১২৫। রাষ্ট্রপতি এরশাদই সর্বপ্রথম ময়মনসিংহের সম্ভুগঞ্জ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১২৬। পল্লীবন্ধু এরশাদ-এর আমলে উত্তরবঙ্গের জনগণের আজন্মের গণদাবী, মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক সর্বপ্রথম উত্থাপিত ও প্রস্তাবিত দাবী যমুনা সেতু নির্মাণের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১২৭। রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের প্রধান শহরের যাতায়াত সহজতর করার লক্ষ্যে অন্তঃনগর ট্রেন চালু করা হয়েছে।

১২৮। এরশাদ সরকারের আমলে প্রতি উপজেলাকে জাতীয় মহা সড়কের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

১২৯। প্রায় সমস্ত উপজেলায় টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১৩০। অধিকাংশ জেলাকে স্বয়ংক্রিয় জাতীয় টেলিফোন ডায়ালিং আওতায় আনা হয়েছে।

১৩১। অনেক জেলায় টেলেক্স সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১৩২। বিদেশের সাথে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ডায়ালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৩৩। গণপরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নততর ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য দেশীয় প্রযুক্তিতে 'সুজন' ও 'মিশুক' নামে টেম্পো ও অটো রিক্সা উদ্ভাবন ও চালু করা হয়েছে।

১৩৪। ঢাকায় গাবতলীর আন্তঃজেলা বাস টারমিনালের ব্যাপক সংস্কার, সায়েদাবাদ ও মহাখালীতে আন্তঃজেলা বাস টারমিনাল নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩৫। ১৯৭৪ সালে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ সার্ভে করে চূড়ান্ত সার্টিফিকেট দিয়ে ঘোষণা করেছিলঃ 'বাংলাদেশে কোন প্রাকৃতিক তেল নেই'। কিন্তু দেশপ্রেমে উদ্বেলিতপ্রাণ রাষ্ট্রপতি এরশাদ তাদের এ সার্ভে ঘোষণার প্রতি আমল না দিয়ে দেশীয় বিশেষজ্ঞদেরকে ব্যাপক অনুসন্ধান ও কাজে নিয়োগ করেন এবং তারা সিলেটের হরিপুরে বাংলাদেশের প্রথম তেলখনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। খনি থেকে তেল আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৩৬। বড় পুকুরিয়াতে বিশাল কয়লা খনি আবিস্কৃত হয়েছে এবং কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৩৭। প্রায় প্রতি উপজেলায় এমনকি কোন কোন ইউনিয়ন-গ্রাম পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়নের আওতায় বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়েছে ।

১৩৮। এরশাদ সরকারের আমলে সর্ব প্রথম ইষ্ট ওয়েষ্ট ইন্টার কানেক্টরের মাধ্যমে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং আশুগঞ্জে ৯০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপন করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

১৩৯। ঘোড়াশালে ও সিলেটে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১৪০। এরশাদ সরকারের আমলে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য ৯৫০ মাইল পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়।

১৪১। এরশাদ আমলে বাখরাবাদে ৫টি, তিতাসে ৩টি, হবিগঞ্জে ২টি, কামতায়-১টি করে মোট ১১টি গ্যাসের কুপ খননের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪২। রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যথার্থ মূল্যায়ন, পুনর্বাসনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন এবং "মুক্তি যোদ্ধারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট সন্তান" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৪৩। ১৯৭২ সালে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়েছিল সত্য কিন্তু ১০ বছরের মধ্যে একখানা ইটও কোন সরকার বিছায়নি। তৎকালীন সরকারের আমলে সাভারে সামান্য নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ এরশাদ সরকারের আমলেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪৪। বিধ্বস্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সম্প্রসারণ করে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪৫। মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এরপর পাশেই বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের কবরের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪৬। মুজিবনগরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪৭। বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনী বিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে।

১৪৮। বীরশ্রেষ্ঠদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি পাকাবাড়ী নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

১৪৯। বীরশ্রেষ্ঠদের স্মৃতি সম্বলিত ডাক টিকেট প্রচলন করা হয়েছে।

১৫০। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের ২২টি শিল্প ও কল কারখানা নামমাত্র মূল্যে ট্রাষ্টের মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২০০ কোটি টাকা মূল্যের এ সব প্রতিষ্ঠানকে আয়কর মুক্ত রাখা হয়েছে।

১৫১। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৫২। পল্লীবন্ধু সরকারই স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ১৬ খন্ড পর্যন্ত রচনা সম্পন্ন করে প্রকাশ করেছেন।

১৫৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা ও মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর পরিবারের জন্য সন্তোষে একখানা পাকাবাড়ী নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

১৫৪। মিরপুরে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এবং পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

১৫৫। সমস্ত জেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং অফিস/ভবন/মিলনায়তন নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হয়েছে ।

১৫৬। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে "বিজয় স্তম্ভ" নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১৫৭। টিভিতে সংবাদ পরিবেশনের প্রাক্কালে জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রদর্শন এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সংগীত পরিবেশনের রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৫৮। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর স্মৃতিকে চির জাগ্রত করে রাখার জন্য ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ওসমানী উদ্যান নির্মাণ করা হয়েছে, এবং বাসগৃহকে ওসমানী যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওসমানী ট্রাষ্ট গঠণ করা হয়েছে। সিলেট বিমান বন্দরের নাম "ওসমানী বিমান বন্দর" এবং সিলেট মেডিকেল কলেজের নাম "ওসমানী মেডিকেল কলেজ" করা হয়েছে।

১৫৯। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসকে যাদুঘর হিসাবে ঘোষণা করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

১৬০। রাষ্ট্রপতি এরশাদই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে স্বাধীন দেশের উপযোগী সর্বাধুনিক সেনাবাহিনীতে রূপান্তর করেছেন।

১৬১। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ আমলে সেনাবাহিনীতে একবারও ক্যু হয়নি এবং ক্যু করার অজুহাতে সেনাবাহিনীর শত সহস্র তো দূরের কথা একজন অফিসার, বৈমানিক, সৈনিককেও ফাঁসিতে লটকানো হয়নি।

১৬২। প্রিয় নবীর ইসলামী আদর্শে আদর্শবান, ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সর্ব প্রথম পল্লীবন্ধু এরশাদ বাংলাদেশ সীরাত মিশন আয়োজিত ১৯৮২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় জাগরণ ও চেতনার উন্মেষ ঘটানো, সমাজ জীবনে ইসলামী মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা। এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পবিত্র ইসলামকে "রাষ্ট্র ধর্ম" হিসাবে সংবিধানে সংযোজন করেছেন এবং জাতীয় সংসদে এ সম্পর্কিত আইন পাশ করেছেন। একই সাথে তিনি অন্যান্য সকল ধর্মের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

১৬৩। রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক সরকারী ছুটির দিন ধার্য্য করেছেন।

১৬৪। রমজান মাসে দিনের বেলায় হোটেল-রেস্তোরা বন্ধ রাখার রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৬৫। জোহরের নামজের জন্য অফিসের কাজে ১৫ মিনিট বিরতি দেয়া হয়েছে।

১৬৬। রেডিও টিভিতে প্রতি ওয়াক্তে আযান প্রচারের রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৬৭। সকল মসজিদের বিদ্যুৎ, পানির বিল রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৬৮। যাকাত তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং শরিয়তের বিধান মোতাবেক এই তহবিলের অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থা হয়েছে।

১৬৯। একদা অপকর্মের আখড়া হিসাবে পরিচিত হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের নোংরা ডোবা ও জঙ্গল পরিষ্কার এবং ভরাট করে সেখানে সুবিশাল জাতীয় ঈদগাহ নির্মাণ করা হয়েছে ।

১৭০। বায়তুল মোকাররম মসজিদকে জাতীয় মসজিদে উন্নীত করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৭১। চট্টগ্রাম আল-ফালাহ মসজিদ ও ইসলামী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

১৭২। মহাখালিতে গাউসুল আজম হজরত আব্দুল কাদের জিলানীর (রঃ) নামে সুবিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

১৭৩। দেশব্যাপী শহর ও পল্লীগ্রামে বহু মসজিদ নির্মাণ ও মেরামতে সরকারী অনুদান দেয়া হয়েছে।

১৭৪। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক চালু করা হয়েছে।

১৭৫। ইসলামী কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৭৬। দীনিয়াত শিক্ষাকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৭৭। রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রতি শুক্রবার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করার রীতি অনুসরণ করেছেন। এ রকম রীতি আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান দেশে-বিদেশে অনুসরণ করেছেন বলে জানা যায়নি।

১৭৮। হিন্দুধর্ম ট্রাষ্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাষ্টের আওতায় বহু মন্দির সংস্কারে রাষ্ট্রীয় অনুদান দেয়া হয়েছে। মন্দিরের পানি, বিদ্যুতের বিল ও ভূমি কর স্থায়ীভাবে মওকুফ করেছেন।

১৭৯। বৌদ্ধধর্ম ট্রাষ্ট গঠন করা হয়েছে। প্যাগোডা নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, মেরামতে সরকারী অনুদান দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ, পানির বিল ও ভূমিকর মওকুফ করা হয়েছে।

১৮০। খৃষ্টানধর্ম ট্রাষ্ট গঠন করা হয়েছে। বহু গীর্জা মেরামতে সরকারী অনুদান দেয়া হয়েছে, বিদ্যুৎ, পানির বিল ও ভূমিকর মওকুফ করা হয়েছে।

১৮১। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দেশত্যাগী হিন্দুদের জমি "শত্রু সম্পত্তি" নামে অভিহিত ছিল। "শত্রু" নাম পরিবর্তন করে "অর্পিত সম্পত্তি" করা হয়েছে। এবং এরশাদ সরকার অর্পিত সম্পত্তি বিক্রি ও হস্তান্তর রহিত করেছেন।

১৮২। এ দেশে সর্ব প্রথম এরশাদ সরকারই মসজিদের ইমামদের বেতন-ভাতা দানের ব্যবস্থা করেছেন।

১৮৩। ইমামদের প্রাথমিক শিক্ষায় ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে সকল ইমামদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ঔষধসহ কিটব্যাগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৪। দেশে অসংখ্য এবতেদায়ী, দাখেলী, হাফেজী, আলিয়া, সিনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন।

১৮৫। ইসলামী ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ করেন এবং প্রতিটি জেলায় ফাউন্ডেশনের শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন।

১৮৬। সাভার ও শান্তিডাঙ্গায় দু'টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার জন্য ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করেন।

১৮৭। পবিত্র কোরআন শরীফ সরকারী কর্মচারী ও চাকুরীজীবিদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৮৮। টংগীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য বিশাল ময়দান নির্মাণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮৯। "আল্লাহু আকবর" খচিত ১০০ টাকার নোট চালু করা হয়েছে।

১৯০। ভি,আই,পি রোডসমূহে ইসলামী ঐতিহ্যমন্ডিত মসজিদের মিনার খচিত সোভা, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সামনে কোরআনের আয়াত খচিত সোভা বর্ধন করা হয়েছে।

১৯১। স্বাধীনতার স্বাদ ও গণতন্ত্রের সুফল এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি পল্লীবাসী মেহনতি কৃষক জনগণের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠি তাদের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের স্বার্থে এদেশে পুলিশী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল প্রায় ২০০ বছর আগে। বৃটিশ শাসন অবসানের পর পাকিস্তানের ২৫ বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ২৫ বছর, বৃটিশ যুগের এই পুলিশী প্রশাসনিক ব্যবস্থাই চালু ছিল। এরশাদ সরকারই প্রথম গোলামী যুগের প্রবর্তিত ব্যবস্থাটি ভাংগার প্রক্রিয়া শুরু করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১০টি পর্যায়ে সমস্ত থানাকে উপজেলায় উন্নীত করেছেন। 'থানা' থেকে 'উপজেলা' শুধুই কেবল নামের পরিবর্তন নয়। সামাজিক বিবেচনায় থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করার মধ্যে রয়েছে অসামান্য তাৎপর্য। থানার প্রকৃত অর্থ ছিল শুধুই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা। কিন্তু উপজেলার কর্মপরিধি সামগ্রিক উন্নতির মধ্যে পরিব্যপ্ত । থানার সর্বময় ক্ষমতা একজন সরকারী কর্মচারীর অর্থাৎ পুলিশ অফিসারের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু উপজেলার সর্বময় কতৃত্ব একজন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির হাতে, যাকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। থানা কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মাত্র

মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু উপজেলায় রয়েছে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। থানা প্রশাসনে জনগণের কোন স্থান ছিল না কিন্তু উপজেলায় প্রত্যেক ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান নিজ নিজ ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এক কথায়, থানা ছিল সর্বেসর্বা, দারোগা পুলিশ ছিল এলাকার দন্ড মুন্ডের কর্তা। কিন্তু উপজেলায় থানা ছিল একটি প্রতিনিধি মাত্র। গ্রাম বাংলার জনগণের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন, স্থানীয় প্রশাসনে সাধারণ জনগণের নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বিচার সুবিধা নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত পল্লীগ্রামের জনগণের জন্য সহজলভ্য করা সর্বোপরি সারা দেশে ব্যাপক উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ দেশের আপামর জনগণের নয়নমণি, দেশ ও জাতির ভাগ্যোন্নয়নে হাজারো সংস্কার ধর্মী কাজের মহানায়ক কারা নির্যাতিত রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু এরশাদ সেই ২০০ বছরের প্রাচীন গোলামী যুগের পুলিশী প্রশাসনিক কাঠামো থানার স্থলে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্ব-শাসিত উপজেলা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সাবেকী সিও বা সার্কেল অফিসারের শাসনের স্থলে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি পরিষদ সকল প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রাধীন হন। উপজেলা ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বিচার সুবিধা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য সহজলভ্য করা হয়। যার ফলে গ্রামের গরীব জনগণকে তাদের মামলা-মকদ্দমা করতে কষ্টার্জিত টাকা পয়সা খরচ করে সীমাহীন দুর্ভোগ স্বীকার করে শহরে আসতে হতো না।

১৯২। এরশাদ সরকার আমলে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হয়। ফলে ক্রমাগতভাবে উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন হাট বাজার, বন্দর, গঞ্জে অসংখ্য অফিস আদালত, দোকান পাট, দালান কোঠা, ইমারত, বহুতল ভবন, সরকারী কোয়ার্টার, স্কুল কলেজ, মসজিদ মাদ্রাসা, হোটেল রেস্তোরাঁ, মিলনায়তন, লাইব্রেরী স্থাপন করা হয় ।

১৯৩। জেলা শহরের সাথে প্রতিটি উপজেলার সরাসরি সকল যোগাযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে অসংখ্য নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরানো রাস্তার সংস্কার, প্রশস্তকরণসহ ব্রীজ, কালভার্ট, পুল, সেতু নির্মাণ করা হয় এবং টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন সাধন করা হয়।

১৯৪। উপজেলায়, গ্রামে-গঞ্জে পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া হয়।

১৯৫। পল্লীবন্ধু সরকার আমলে উপজেলা পর্যায়ে অনেক নতুন শিল্প, কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

১৯৬। উপজেলা ব্যবস্থায়, স্থানীয় প্রশাসন এবং পল্লী উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ায় প্রতিটি উপজেলায় অনেক নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

১৯৭। উপজেলাকে কেন্দ্র করে এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সুবাদে রাজধানী ঢাকা থেকে বড় বড় সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাকটর, ব্যবসায়ীরা গ্রামে আসেন, আইনজীবিরা উপজেলায় চেম্বার খোলেন, শহরের অনেক শিক্ষিত এবং অভিজাত পরিবার উপজেলায় এসে বসবাস শুরু করায় তার প্রভাবে গ্রামীণ জনজীবনে অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দেয়। উপজেলাগুলো পরিণত হয় এক একটি মিনি শহরে । সর্বোপরি উপজেলা প্রতিষ্ঠার কারণে গ্রামীণ জনগণের জীবিকা ও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে এক আমুল বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯৮। প্রশাসনিক সংস্কার সাধন ও বিকেন্দ্রীকরণে উপজেলা প্রশাসন পদ্ধতি চালু করার ফলে গ্রাম বাংলায় বসবাসকারী শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর গ্রামীণ মানুষের নির্ভরশীলতা হ্রাস ও আত্মনির্ভরশীলতার শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতীতের উপেক্ষিত স্থানীয় সম্পদ সংগঠিত করে কাজে লাগানো হয়। "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস"। সত্যিকার অর্থে উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করে এ শ্বাশ্বত স্লোগানের বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৯৯। প্রশাসনিক সংস্কার সাধনে থানা-মহকুমা, জেলা, বিভাগ, কেন্দ্রীয় প্রশাসন এই পাঁচ স্তরের প্রশাসন ছিল বৃটিশের ঔপনিবেশিক প্রশাসন পদ্ধতি। পল্লীবন্ধু এরশাদ এর মধ্যে ৩ স্তরবিশিষ্ট প্রশাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পুলিশ প্রধান থানাকে উপজেলা, আমলা প্রধান সব মহকুমাকে ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ৯টি পর্যায়ে জেলায় উন্নীত করেন।

২০০। "বিলম্বিত বিচার, বিচার অস্বীকৃতিরই নামান্তর'। বিচার বিলম্ব করার কারণসমূহ দূরীভূত করে দ্রুত ও সহজলভ্য বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকারের আমলে রাজধানী ও শহর কেন্দ্রীক বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়।

২০১। রাজধানী ঢাকার ১টি মাত্র হাইকোর্ট বেঞ্চের জায়গায় প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬টি জেলায় অতিরিক্ত হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়।

২০২। প্রতিটি উপজেলায় মুন্সেফ কোর্ট স্থাপন এবং নব গঠিত জেলাগুলোতে জেলা ও দায়রা জজ নিয়োগ করা হয়।

২০৩। বিচার পরিচালনার জটিলতা দূর করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি সহজতর করার জন্য ১৮৯৮ সালের দেওয়ানী আইন সংশোধন করা হয়।

২০৪। পল্লীবন্ধু সরকার আমলে ফৌজদারী মামলার বিচার ৬০ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করার বিধান চালু করা হয়।

২০৫। পল্লীবন্ধু এরশাদ উপজেলা আদালত ও পারিবারিক আদালত গঠন করেন। আগে যে কোন ধরনের বিচার-আচারের জন্য জনগণকে দূরবর্তী মহকুমায় যেতে হত। থানা কর্তৃপক্ষ আসামী গ্রেপ্তার করে কোমরে দড়ি বেঁধে ২০ বা ৪০ মাইল দূরবর্তী মহকুমায় ছুটতো আসামীকে বিচারকের সামনে হাজির করার জন্য। একটি স্বাধীন দেশের একজন নাগরিকের জন্য এ ব্যবস্থা কি নিদারুণ অপমানজনক। তা যাদের কোমরে দড়ি পড়েনি, হাতে হাতকড়া পড়েনি, তাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় গ্রেপ্তারকৃতদের আত্মীয় স্বজনের হয়রানি এবং পুলিশের হয়রানির প্রশ্নও ছিল। এমন কি এ ব্যবস্থায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে আসামীকে বিচারকের সামনে হাজির করার বিশ্বজনীন আইন সংগত কারণে লংঘিত হতে থাকে। এরশাদ সরকার এই অপমান ও হয়রানি থেকে জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। গ্রেপ্তার করে আনার পর আর বিচারকের জন্য ৪০ মাইল দূরে ছুটতে হয় না, কয়েক গজের মধ্যে প্রায় একই কমপ্লেক্সে বিচারকের সামনে আসামীকে হাজির করা যায়। উপজেলায় মুন্সেফী আদালত স্থাপনে জমি-জমা সংক্রান্ত কোন বিরোধের ব্যাপারেও বহু কষ্টে মহকুমায় যেতে হয় না।

২০৬। পল্লী বন্ধু এরশাদ সরকার দেশের সার্বিক কল্যাণ এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সুঃসংহত করার মহান লক্ষ্যে স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার রক্ষা করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বজায় রাখা, মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সু-সংহত করার লক্ষ্যে বিরামহীন প্রয়াস চালিয়ে বহিঃর্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি বাড়িয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশকে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু ও সুহৃদ হিসেবে পরিগণিত করতে সক্ষম হয়েছে।

২০৭। ভারতের সাথে বাংলাদেশের ২৫ বছরের একটি "গোলামী চুক্তি" থাকার ফলে বহির্বিশ্বে কোন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক চুক্তি ও সম্পর্ক করতে হলে পূর্বাহ্নে দিল্লী সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হতো। এই নীতির কারণে বাংলাদেশের বেরুবাড়ী, তিনবিঘা, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, মশালডাংগাসহ প্রায় ১২টি ছিট মহল, দক্ষিণ তালপট্টিতে ভারত আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ফারাক্কাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে ভারত বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি সরবরাহ বন্ধ করে, নিয়ন্ত্রণ করে, এক তরফা ভাবে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ করছে, অপর দিকে উক্ত গোলামী চুক্তি বা সম্পর্কের সুবাদে বাংলাদেশের আভ্যন্তরে ট্রেনিং প্রাপ্ত ব্যাপক চোরাচালানীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলাদেশের বাজার ভারতের কব্জায় নেয়ার প্রয়াস চালাতে থাকে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ও "অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি"। আর স্বাধীন দেশের অর্থনীতির মূল উৎসই হল বাজার। সেই বাজার যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্থহীন হয়ে যায়, বিপন্ন হয়ে পড়ে। বৃটিশের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টান্তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট । ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে প্রায় দু'শ বছর

বৃটিশ বেনিয়ারা ভারতকে ছলে বলে কলে কৌশলে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে শোষণ-শাসন করে। এ দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার সুবাদে এখন বৃটেন একটি ভদ্র, উন্নত, সভ্য শিক্ষিত, গণতান্ত্রিক মডেল দেশ হিসাবে বিশ্ব দরবারে নিজেদের জন্য মর্যাদার আসন দখল করে নিয়েছে। এরশাদ সরকার বিদেশীদের কবল থেকে বাংলাদেশের বাজার রক্ষার জন্য কার্যকর কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

২০৮। এরশাদ তাঁর ঘোষিত বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী প্রতিবেশী ভারত ও বার্মার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন করেছেন। ফলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তিচক্রের মদদপুষ্ট শান্তিবাহিনীর হামলা, চাকমা, রহিংগা সমস্যা-সংকটের মিমাংসা ক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল হন।

২০৯। সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমীরাত, মিশর, জর্দ্দান, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ সকল মুসলিম দেশের সাথে গভীর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেন।

২১০। এছাড়া, চীন, জাপান, জার্মান, কানাডা, ফ্রান্স, আমেরিকা, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের সু-সম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

২১১। রাষ্ট্রপতি এরশাদ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্কের) সম্মেলনে প্রথম চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন এবং তার আমলেই সার্কের কার্যক্রমে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রায় ১০০ কোটি মানুষের ঐক্যের পতাকা বহনের গৌরব বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

২১২। বিএনপিসহ দেশে তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণ করার বিরুদ্ধে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে সর্বাগ্রে রাষ্ট্রপতি এরশাদই স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই পদক্ষেপের কারণে সৌদী আরবে আজ ২০ লক্ষ বাংলাদেশী অবস্থান করতে পারছে ও কুয়েতে ৩ লক্ষ বাংলাদেশী বসবাস করছে। এই অবদান একমাত্র এরশাদের কৃতিত্ব।

২১৩। বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের সাথে কার্যকর আলোচনাক্রমে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধন করা হয়েছে।

২১৪। এরশাদ সরকার আমলেই সর্ব প্রথম মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসহ রাষ্ট্রপতি এরশাদ ২ বার দহগ্রাম সফর করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদের আগে পাকিস্তান আমলের ২৫ বছর এবং বাংলাদেশ আমলের এত বছরে এই ছিট মহলটিতে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে একজন তহশিলদারও যায়নি। উল্লেখ্য, ছিট মহলে যাওয়ার জন্য একটুখানি করিডোর তিনবিঘা দেয়ার আশ্বাসে মুজিব সরকার ভারতকে আমাদের দেশের একটি ইউনিয়ন বেরুবাড়ি দিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য বেরুবাড়ির বদলে সে করিডোর তিনবিঘার উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা আজও সম্ভব হয়নি।

২১৫। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের যৌথ জরীপ পরিচালনায় ভারতকে সম্মত করানো সম্ভব হয়েছে, ঐ দ্বীপের উপর এক তরফা দাবী প্রত্যাহারে ভারতকে বাধ্য করা হয়েছে।

২১৬। সীমান্তে ভারত কর্তৃক এক তরফা কাঁটাতারের বেড়া ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণের প্রকল্প স্থগিত করতে ভারতকে বাধ্য করা হয়েছে।

২১৭। এরশাদ সরকার আমলে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি বণ্টনের প্রশ্নে শুষ্ক মৌসুমে পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানে ভারতের সাথে তিন বছর মেয়াদী স্মারক চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

২১৮। নেপালের বিরুদ্ধে ভারতীয় পণ্য অবরোধের মুখে এরশাদ সরকার নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেদের ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের আমদানীকৃত ডিজেল ও চিনি নেপালকে সরবরাহ করে 'বিগ ব্রাদার' সুলভ হঠকারীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছে।

২১৯। শ্রীলংকার বিদ্রোহীদের জন্য সাহায্য প্রেরণে ভারতের শক্তি প্রয়োগের নীতিকে বলিষ্ঠভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

২২০। এরশাদ সরকার আমলে বাংলাদেশ ৭৭ জাতি গ্রুপের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় গ্রুপের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় এবং হাভানা অধিবেশনে বাংলাদেশকে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

২২১। ইরান-ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ অবসানের জন্য গঠিত শান্তি কমিটির সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২২২। ইরান-ইরাক যুদ্ধ অবসানের তদারকীর কাজে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তি বাহিনীতে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতিসংঘের কোন বাহিনীতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এই প্রথম।

২২৩। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১৯৮৭ সালে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

২২৪। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এরশাদের গৃহীত কর্মপন্থা ও পদক্ষেপের কারণে 'তলাহীন ঝুড়ির' খেতাব মুছে ফেলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা, ভাবমূর্তি অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের কদর অনেক বেড়ে যায়।

২২৫। পথ-কলি, ট্রাষ্টের মাধ্যমে টোকাই শিশুদের বিনা মূল্যে শিক্ষা ও প্রতিদিন দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু হল ও জিয়া হল নির্মাণ, রাজধানীর রোকেয়া স্বরণী, বিশ্ব রোড, বেঁড়ীবাধ নির্মাণ সহ অসংখ্য কাজ করেছেন। ১৯৮৯ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম মোবাইল ফোন ও স্যাটেলাইট টিভি, ভূ-উপগ্রহ মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ স্থাপন করেছে, আইএসপি-তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নতুন ইতিহাস গড়েছেন। নিপীড়িত নির্যাতিত ও সাধারণ জনগোষ্ঠির আশার সঞ্চার করেছেন। এরশাদ সরকারের ১৯৮০ দশকের ৯ বৎসর ছিল উন্নয়নের স্বর্ণযুগ।

২২৬। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ আমলে ব্যাংক থেকে অর্থ লুট বা লুটপাটের একটিও উদাহরণ নেই; যেখানে গত ২৫ বছরে ব্যাংক থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা পাচার ও লুটপাট হয়েছে।

২২৭। এইচ এম এরশাদের আমলে বড় ধরনের কোনো দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি।

২২৮। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে ইভটিজিং বা নারী ও শিশু পাচারের কোনো ঘটনা ঘটেনি; যদিও এটা আজকাল খুব সাধারণ।

২২৯। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে কোনো গুম, খুন, মিথ্যা মামলা, সন্ত্রাস বা চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেনি। যদিও এটি আজকাল খুব সাধারণ।

২৩০। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে সরকারী পর্যায়ে কোনো দুর্নীতি হয়নি। যেখানে এটি নিত্যনৈমিত্তিক ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২৩১। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে সরকারি ও আধাসরকারি সকল নিয়োগ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়েছিল।

২৩২। ঘুষ বা প্রভাবের একটি মামলা ও হয় নাই। যদিও, এটি আজকাল অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২৩৩। শিক্ষার মান ছিল উচ্চ এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য মানের। এটিরও অধঃপতন হয়েছে।

২৩৪। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে সুখী মধ্যবিত্তের জনসংখ্যা ছিল প্রচুর। এখন মধ্যবিত্ত চরম অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছে এবং দারিদ্র্যের কবলে পড়েছে।

২৩৫। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে আশা, আকাঙ্খা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ ছিল। এখন মানুষ ভালো স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষাও নেই।

২৩৬। ১৯৯১-৯৬ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে জাতীয় পার্টি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, স্ত্রী বেগম রওশন এরশাদ, নাবালক সন্তান জেবিন ও সাদ এরশাদকে আটক ও কারারুদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে বন্দী করা হয়। আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি সেইসব নেতা-কর্মীদের যারা বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ভুক্তভোগী ও জীবন হারিয়েছেন।

২৩৭। দেশের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ না থাকায় কর্মসংস্থানের বাজার অন্ধকার, শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের কোন স্বীকৃতি না থাকায়, ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাস, আইনের শাসনের দুর্বলতা ও ন্যায়বিচারের অভাব, সমতার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, স্বজনপ্রীতি, পরিবেশগত অবক্ষয় ইত্যাদি। তাই শিক্ষিত এবং যোগ্য তরুণরা কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং বিদেশের মতো দেশে অভিবাসনের জন্য যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই ভাবে পিতামাতা তাদের সন্তানদের যত্ন ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সন্তানেরা তাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের ভালবাসা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমরা সবাই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির এই স্বপ্ন কি দেখেছিলাম ?

আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হব

আমরা পরিবর্তন, ষড়যন্ত্র এবং চ্যালেঞ্জের হাওয়া অনুভব করেছি এবং আমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছি।

একটি সুন্দর গাছের শিকড়ের মতো, আমাদের বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি আমাদের শক্তভাবে রোপন করবে। দুর্দিনে আমাদের নিবেদিতপ্রাণ ও পরীক্ষিত কর্মীরাই আমাদের শক্তি এবং আমরা আশা-আকাঙ্খা, দুর্নীতি এবং সব ধরনের শোষনমুক্ত নতুন বাংলাদেশের আদর্শে বিশ্বাসী।

আমাদের ইতিবাচক এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। বিশ্বাস করুন সব কিছু সম্ভব এবং আমরা ক্ষমতায়িত হব। সৎ, নিবেদিতপ্রাণ, ভালো নৈতিক চরিত্র, দেশপ্রেমিক নেতৃত্বে নতুন প্রজন্মের কাছে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি থাকবে। বিশ্বাস করুন আমরা যুদ্ধে জিতব এবং চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠব। জাতীয় পার্টি আরও শক্তিশালী হবে এবং বাংলাদেশে চিরকাল বেঁচে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

—— রওশন এরশাদ

নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা

– হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম।
নব জীবনের ফুল ফোটাবো
প্রাণে প্রাণে আজ দীক্ষা নিলাম,
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম।

যেখানে থাকবে না দুর্নীতি দুঃশাসন,
যেখানে থাকবে না নিপীড়ন নির্যাতন,
যেখানে থাকবে না বঞ্চনা গঞ্জনা,
সেখানে আমাদের ঠিকানা লিখলাম।
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা,
নতুন করে আজ শপথ নিলাম।

মাটি আর মানুষের সমন্বয় সাধনে,
সুখ সমৃদ্ধি আসবে জীবনে,
এগিয়ে চলবো সমুখের পানে,
স্রষ্টার কাছে এই শপথ নিলাম।
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম।
নব জীবনের ফুল ফোটাবো,
প্রাণে প্রাণে আজ দীক্ষা নিলাম।
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম।
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা।

সম্পাদনায় ঃ

সাবেক রাষ্ট্রদূত **গোলাম মসীহ্,** এল, এল, বি

রাজনৈতিক সচিব, মাননীয় বিরোধীদলীয় **নেতা বেগম রওশন এরশাদ,** এম পি

ও

সাবেক চেয়ারম্যান, এরশাদ মুক্তি পরিষদ